ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প

সম্পাদনা

অশোককুমার মিত্র

পুনশ্চ

সূচিপত্র

কুঁজো আর ভূত	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১
হরতনের গোলাম	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৪
কী	হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৩
মেডেল	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮
চাঙড়িপোতার চণ্ডীভূত	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	২৬
মোক্তার ভূত	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫
পালোয়ান ভূত	মনোজ বসু	৩৯
অভাবিত	প্রমথনাথ বিশী	৪৪
ভূতুড়ে খাদ	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৪৯
ভূত যদি বোকা হয়	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৫৬
দুর্যোগের রাতে	রবীন্দ্রলাল রায়	৬৯
পিলখানা	লীলা মজুমদার	৭৩
শনিবার রাত দুপুরে	আশাপূর্ণা দেবী	৭৮

হারাণবাবুর ওভারকোট নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ..... ❑ ৮৩
জ্যান্ত ভূতের গল্প বিমল মিত্র ..... ❑ ৮৭
অলৌকিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ..... ❑ ৯১
সাংঘাতিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ..... ❑ ৯৭
গগন চৌধুরির স্টুডিয়ো সত্যজিৎ রায় ..... ❑ ১০৩
বাচ্চা-ভূতের খপ্পরে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ..... ❑ ১১১
পরছায়া শিশিরকুমার মজুমদার ..... ❑ ১১৬
ফল্গুর ছোটুদা মহাশ্বেতা দেবী ..... ❑ ১২১
বহুপ্রকার ভূত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ..... ❑ ১৩১
অলৌকিক ছুরি পূর্ণেন্দু পত্রী ..... ❑ ১৩৬
ধরা-ছোঁয়ার বাইরে আনন্দ বাগচী ..... ❑ ১৪১
হীরাপুর 'ডগ শো' প্রফুল্ল রায় ..... ❑ ১৪৭
রাত্তিরবেলা একা একা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ..... ❑ ১৫৬
ভূতের খেলা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ..... ❑ ১৬১
গন্ধটা খুব সন্দেহজনক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ..... ❑ ১৬৫
পর্যটক রহস্য অজেয় রায় ..... ❑ ১৭১
ভূতের নাম চন্দ্রবিন্দু সুনীল জানা ..... ❑ ১৭৮
ডিসট্যান্ট সিগন্যালের আলো অশোককুমার মিত্র ..... ❑ ১৮৪

কুঁজো আর ভূত

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

কানাই বলে একটি লোক ছিল, তার পিঠে ছিল ভয়ংকর একটা কুঁজ। বেচারা বড্ড ভালোমানুষ ছিল, লোকের অসুখ-বিসুখে ওষুধপত্র দিয়ে আমাদের কত উপকার করত। কিন্তু কুঁজো বলে তাকে কেউ ভালোবাসত না। কানাইয়ের ঝুড়ির দোকান ছিল; আর কোনো ঝুড়িওয়ালা তার মতো ঝুড়ি বুনতে পারত না। তারা তাকে ভারি হিংসে করত, আর তার নামে যা-তা বলে বেড়াত। তা শুনে লোকে ভাবত কানাই বড়ো দুষ্টু লোক; তাকে দেখতে পেলে সকলে মুখ ফিরিয়ে থাকত। বেচারার দুঃখের সীমাই ছিল না।

এত বড়ো কুঁজ নিয়ে মাথা গুঁজে চলতে কানাইয়ের বড়োই কষ্ট হত। একদিন সে একটু দূরে এক জায়গায় ঝুড়ি বেচতে গেল, আর দিন থাকতে ঘরে ফিরতে পারল না। পথে একটা পুরোনো বাড়ির কাছে এসে এমনি অন্ধকার হল, আর তার এতই কাহিল বোধ হল যে, আর চলা অসম্ভব। যে জায়গাটা ভারি বিশ্রী; লোকে প্রাণান্তেও সে পথে আসতে চায় না বলে, ওটা ভূতের বাড়ি। কিন্তু কানাইয়ের বড্ডই পরিশ্রম হয়েছে, চলবার আর সাধ্য নেই। কাজেই সে সেখানে পথের পাশে একটু না বসে আর কী করে?

কতক্ষণ সে এভাবে বসেছিল তার কিন্তু ঠিক নেই। বসে থাকতে থাকতে তার মনে হল যেন সেই পুরোনো বাড়িটার ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে। অনেকগুলো গলা মিলে, আহা, কী সুন্দর সুরেই গাইছে। শুনে কানাইয়ের প্রাণ জুড়িয়ে গেল। সে অবাক হয়ে খালি শুনতেই লাগল। গানের সুরটি অতি আশ্চর্য কিন্তু কথা খালি এইটুকু :

'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হিং হ্যায়।'

শুনতে শুনেতে কানাই একবারে মেতে গেল, সে ভাবল যে তারও গানটা না গাইলেই চলছে না। কাজেই সেও খুব করে গলা ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে ধরল : 'লুন হ্যায়, তেল হ্যায় ইম্‌লী হ্যায়, হিং হ্যায়।

এইটুকু গেয়েই ঝাঁ করে তার বুদ্ধি খুলে গেল, সে আরও উঁচু সুরে গাইল :

লসুন হ্যায়, মরীচ হ্যায়, চ্যাং ব্যাং শুঁটকি হ্যায়।

কানাই এই কথাগুলো খুব গলা ছেড়েই গেয়েছিল—সে গলার আওয়াজ যে সেই বাড়ির ভিতরের গাইয়েদের কানে গিয়ে পৌঁছিয়েছিল, তাতে আর কোনো ভুল নেই। সে গাইয়েগুলো ছিল অবশ্য ভূত। তারা সেই নতুন কথাগুলো শুনে এতই খুশি হল যে, তখনই ছুটে কানাইয়ের কাছে না এসে আর থাকতে পারল না। তারা এসে কানাইকে কোলে করে নাচতে নাচতে সেই বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল, আর আদরটা যে করল। মিঠাই যে তাকে কত খাওয়াল তার অন্ত নেই। তারপর সকলে মিলে নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগল :

লুন হ্যায় তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হিং হ্যায়।
লসুন হ্যায়, মরীচ হ্যায়, চ্যাং ব্যাং শুঁটকি হ্যায়।

কানাইকেও তাদের সঙ্গে নেচে নেচে গানটি গাইতে হল। তখন হঠাৎ তার মনে হল, 'কি আশ্চর্য, আমি কুঁজ নিয়ে চলতে পারি না, আমি আবার নাচলুম কী করে? বলতে বলতেই তার হাতখানি পিঠের দিকে গেল—এ কী? তার সে কুঁজ যে আর নেই। একজন ভূত বলল, 'কি দেখছিস বাপ? ওটা আর ওখানে নেই, ঐ দেখ, তোর পাশে পড়ে আছে।'

সত্যি সত্যি সে কুঁজ আর কানাইয়ের পিঠে ছিল না, সেটা তার পাশে পড়েছিল। আহা! কানাইয়ের তখন কী আনন্দই হল! আর হালকা আরাম বোধ হল তখুনি, যে সে তখনই সেইখানে মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর যখন পরদিন

সকালে তার ঘুম ভাঙল, তখন সে দেখল যে সেই বাড়ির বাইরে রাস্তার ধারে শুয়ে আছে; ভূতেরা তাকে একটি চমৎকার নতুন পোশাক পরিয়ে সেখানে এনে রেখে গিয়েছে। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠে, মনের সুখে বাড়ি চলে এল। সেখানকার লোকেরা তার মুখের পানে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, কেউ তাকে চিনতে পারে না। সে যে তাদের সেই কুঁজো কানাই, ভূতেরা তার কুঁজ ফেলে তার এমনি সুন্দর চেহারা করে দিয়েছে, একথা তাদের বোঝাতে তার অনেকক্ষণ লেগেছিল।

তারপর দেখতে দেখতে কানাইয়ের কুঁজের গল্প দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। যে শুনল, সেই ভাবল যে, এমন আশ্চর্য কথা আর কখনও শোনেনি। এখন আর লোকে তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে থাকে না; তারা হাসতে হাসতে ছুটে এসে তার সঙ্গে কথা কয়, আর বাড়ির লোককে তার এই আশ্চর্য খবর শোনাবার জন্য তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। কত লোকে শুধু সেই গল্প শোনবার জন্যই তার ঝুড়ি কিনতে আসে। ঝুড়ি বেচে সে বড়োলোক হয়ে গেল।

এমনি করে দিন যাচ্ছে। তারপর একদিন কানাই তার ঘরের দাওয়ায় বসে ঝুড়ি বুনছে, এমন সময় একটি বুড়ি সেই পথে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁগা, কেবলহাটি যাব কোন্ পথে?' কানাই বললে, 'এই ত কেবলহাটি; তুমি কী চাও?' বুড়ি বলল, 'তোমাদের গ্রামে নাকি কানাই বলে কে আছে, ভূতেরা তার কুঁজ সারিয়ে দিয়েছিল। তার মন্তরটা তার কাছ থেকে শিখে নিতে পারলে আমাদের মানিকের কুঁজটাও সারিয়ে নিতুম।'

কানাই বলল, 'আমিই ত সেই কানাই, ভূতেরা আমারই কুঁজ সারিয়ে দিয়েছিল। এর ত মন্তর-টন্তর কিছু নেই, তারা রাত জেগে গাইছিল, আমি পথের ধারে শুয়ে শুয়ে তাদের গানে নতুন কথা জুড়ে দিয়েছিলাম। তাইতে তারা খুশি হয়ে আমার কুঁজ সারিয়ে, নতুন পোশাক পরিয়ে দিয়েছিল।' বুড়ি তখন খুঁটে খুঁটে সব কথা কানাইয়ের কাছে থেকে জেনে নিয়ে তাকে অনেক আশীর্বাদ করে সেখান থেকে চলে গেল।

সেই বুড়ির ছেলে যে মানিক, তার পিঠে ছিল কানাইয়ের কুঁজের চেয়েও ঢের বড়ো একটা কুঁজ । লোকটা এমনি দুষ্টু আর হিংসুটে ছিল যে পাড়ার লোকে তার জ্বালায় অস্থির থাকত। সেই মানিকের কুঁজ সারাবার জন্য তার বাড়ির লোকেরা একদিন রাত্রে তাকে গাড়ি করে এনে ভূতের বাড়ির কাছে রেখে গেল। সেখানে পড়ে পড়ে মানিক ভাবছে ভূতেরা কখন গান ধরবে, আর তাতে সে কথা জড়ে দেবে আর তার কুঁজ সেরে যাবে। তারপর যেই ভূতেরা বলেছে: 'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়,' অমনি মানিক আর তাদের শেষ করতে না দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'গুরুচরণ ময়রার দোকানের কাঁচাগোল্লা হ্যায়।'

তখন গানের তাল ভেঙে তো গেলই, কাঁচাগোল্লার নাম শুনে অনেক ভূতের বমি পর্যন্ত হতে লাগল। ভূতেরা এসব জিনিসকে বড্ড ঘৃণা করে, এর নাম অবধি শুনতে পারে না। কাজেই তারা তাতে বেজায় চটে দাঁত খিঁচুতে খিঁচুতে এসে বলল, 'কে রে তুই, অসভ্য বেতালা বেটা, আমাদের গান মাটি করে দিলি? দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি।' এই বলে তারা কানাইয়ের সেই কুঁজটা এনে মানিকের কুঁজের ওপরে বসিয়ে এমনি করে জুড়ে দিল যে আর কিছুতেই তাকে তুলবার জো নেই।

পরদিন মানিকের বাড়ির লোকেরা এসে তাকে দেখে অবশ্য খুবই আশ্চর্য আর দুঃখিত হল কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলল, 'বেটা যেমন দুষ্টু, তেমনি সাজা হয়েছে।'

হরতনের গোলাম

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

তোমরা অনেক আশ্চর্য ঘটনা কানে শুনেছ, কিন্তু আমি চোখে দেখেছি এক অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত ঘটনা। তখন আমার বয়স অল্প—বোধহয় তেরো-চোদ্দো।

বৃন্দাবন, ডাক নাম বিনু, ছিল আমার সবচেয়ে ভালোবাসার বন্ধু। এক ক্লাসে পড়তাম, দিনরাত একসঙ্গে থাকতাম, সে ছাড়া আর কারও সঙ্গে খেলতে, কথা-কইতে আমার ভালো লাগত না। আমাদের কাছেই ছিল তাদের বাড়ি।

তখন আমরা নতুন তাস খেলতে শিখেছি। বিনু সেবার একদিনের জন্য মামার বাড়ি গিয়ে বিস্তি খেলা শিখে এসেছিল। এসেই সে আমায় ওই খেলা শিখিয়ে দিল। দু জনেই নতুন খেলিয়ে, কিন্তু বিনু দু-চার বাজি খেলেই পাকা ওস্তাদ হয়ে উঠল। আমি প্রায় প্রতি হাতেই তার কাছে হারতাম। কোথায়ই বা তাকে জিতেছি? স্কুলের লেখাপড়ার প্রাইজে, খেলাধুলার প্রাইজে সে বরাবরই আমায় হারিয়ে এসেছে। এমন কি নিমন্ত্রণ খেতে বসেও কোনোদিন তাকে জিততে পারিনি—সে বরাবর আমার চেয়ে বেশি খেয়েছে। এক এক সময় সন্দেহ হত আমার মায়ের স্নেহটিও বুঝি সে আমার চেয়ে বেশি করে জিতে নিল। কিন্তু এতে আমার দুঃখ ছিল না। কারণ তাকে যে আমি সত্যিই ভালোবাসতাম।

রোজ সন্ধ্যার পর স্কুলের পড়া শেষ করে, খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের সদরবাড়ির পশ্চিম কোণে ভাঙা নহবতখানার নীচের অন্ধকার ঘরটায় লুকিয়ে বসে তাস খেলতাম। এই ঘরটায় পুরাকালে কে থাকত জানি না। এ বাড়ি যখন জমজমাট ছিল, তখন হয়তো কর্তাদের সানাইওয়ালারা এইখানেই বসবাস করত। এখন এখানে দিনে রাতে কারও পায়ের ধুলো পড়ে না—এক চুপিচুপি আমাদের ছাড়া। এই ঘরটা আমাদের দুই বন্ধুর ভারি মনের মতো ঘর ছিল—এর মধ্যে বাড়ির ভেতরকার তাড়াহুড়া এসে পৌঁছোতে পারত না; আমরা দুজনে পায়রার খোপের মতো একটুখানি জায়গায় বেশ নির্জনে নিশ্চিন্তে মুখোমুখি বসে মনের সুখে অবিরাম গলগল করতে পারতাম। আমাদের ছুটির দিনগুলো নির্বিঘ্নে নিবিড় আনন্দে কাটত—এই ঘরখানির কোলে মাথা রেখে শুয়ে। বিনু নিজের হাতে ওই ঘরের একটি কোণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখত। এর কোনো আভরণ ছিল না—এর সমস্ত অভাব ও দৈন্যকে আমরা আমাদের অন্তরের আনন্দ দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম। নইলে সেই কঙ্কালসার জীর্ণ অন্ধকার কোটরের মধ্যে আমাদের কচি দুটো প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠতে পারত না।

বিনু মামার বাড়ি থেকে একজোড়া তাস সংগ্রহ করে এনেছিল—বোধহয় তার মামাদের আড্ডার পরিত্যক্ত তাস। তাস জোড়াটা ছিল খুবই পুরোনো—ভদ্রসমাজে নিতান্তই অচল। সম্ভবত তাই এত সহজে সে বেচারা ওস্তাদ খেলোয়াড়দের কড়া হাতের কঠিন চাপড় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিনুর ছোট্ট নরম হাতখানিতে এসে পড়বার সৌভাগ্য পেয়েছিল। বেচারাকে যে অনেকদিন ধরে অনেক চড়চাপড় সইতে হয়েছে সে তার চেহারা দেখলেই বোঝা যেত। কিন্তু কোন্ গুরুতর অপরাধে তার কানগুলো যে এমন নির্দয়ভাবে কাটা গিয়েছিল এবং কেনই বা তার বুকের ওপর আঁচড় টেনে টেনে এমন ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারতাম না। এ তার কোন্ পাপের শাস্তি?—কে জানে!

তার এই জীর্ণশীর্ণ চেহারা দেখে আমাদের কেমন মায়া করত; সেইজন্যে তার ওপর জোরজবরদস্তি করতে পারতাম না। একে নিয়ে অতিসন্তর্পণে খেলতাম—আস্তে আস্তে তুলতাম, আস্তে আস্তে ফেলতাম, ভাঁজতাম খুব আলগা হাতে। খেলা শেষ হয়ে গেলে ধীরে ধীরে গুছিয়ে একখানি রুমাল মুড়ে তুলে রাখতাম অতি যত্নে। সত্যি বলছি এই তাসকে এত ভালোবাসতাম আমরা যে এর বদলে নতুন ঝকঝকে তাস কিনে আনতে আমাদের লোভটুকু পর্যন্ত হয়নি। কোনোদিন। এই তাসের ছবি

দেখে আমার মনে হত—এরা যেন এককালে এই বাড়িরই মানুষ ছিল, এখন তাস হয়ে গেছে। তোমরা হেসো না; এর হরতনের গোলামটিকে আমার মনে হত ঠিক যেন বুড়ো ঠাকুদার দরোয়ান এ! এর ফোঁটা-ওয়ালা তাসগুলোও যেন কেমন একরকমের। এক একদিন বিনুর সঙ্গে খেলতে খেলতে প্রদীপের ঝাপসা আলোয় এর আটা নওলা-দওলার রঙিন ফুটকিগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ আমার চোখ কেমন ধাঁধিয়ে যেত—মনে হত আমি যেন তাদের ওই ফুটকিগুলোর ফাটলের মধ্যে দিয়ে কতদূর চলে গেছি—সে যেন কতকালের আগেকার কোন্‌খানে!—যারা অনেক কাল আগে এখানে ছিল যেন তাদের কাছে! সেখানে কী দেখতাম, কী শুনতাম মনে নেই কিন্তু সেসব দেখে শুনে কেমন তন্ময় হয়ে যেতাম। হঠাৎ বিনুর ডাকে আবার ফিরে আসতাম। সে ধমক দিয়ে বলত—'কী বসে বসে ভাবছিস?—খেল না!' আমি অমনি তাড়াতাড়ি যাহোক একখানা তাস ফেলে দিয়ে খেলায় আবার মন দিতাম। কিন্তু বুকটা কেমন ছমছম করতে থাকত। মনে হত এ নিশ্চয় যাদুকর তাস!

বিনুকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'এই তাস নিয়ে তোর মামার বাড়িতে কারা খেলতরে বিনু?' বিনু বলেছিল—'শুনেছি দাদামশাই খুব পাকা খেলিয়ে ছিলেন; কেউ নাকি তাঁকে তাস খেলায় হারাতে পারত না। লোকে হিংসে করে বলত, সে তাঁর খেলার গুণ নয়, তাসের গুণ! তিনি তাস গুণ করতে জানতেন। বোধহয় এ তাঁরই আমলের তাস।' বিনুর দাদামশাইকে আমরা চোখে দেখিনি; তার মামাদেরই দেখতাম খুব বুড়ো! উঃ, তাহলে না জানি তিনি কত বুড়ো! এ সেই আদ্যিকালের বদ্যি বুড়োর হাতের গুণ করা তাস! এ তাস ছুঁতে বুক ছমছম করত, কিন্তু তবু ভালোবাসতাম বিনুর দেওয়া এই তাস জোড়াটাকে।

এই তাস নিয়ে বিনু গম্ভীর মুখে রোজ আমার সঙ্গে খেলত। তাকে খেলায় জিততে পারতাম না বলে সে প্রায়ই হাসতে হাসতে বলত—'জানিস মল্লি, এ আমার দাদামশাইয়ের গুণ করা তাস! এ তাসে হাতে থাকলে কেউ আমায় জিততে পারবে না—তুইও না!'

আমাদের আড্ডা ঘরের দেওয়ালে গোরুর চোখের মতো একটা সরু কুলুঙ্গিতে ছোট্ট একটি তেলের প্রদীপ জ্বলত—আমাদের বসবার কোণটুকু আলো করে; বাকি ঘরটা অন্ধকারের আবছায়ায় পড়ে থাকত—কালো চাদর মুড়ি দিয়ে। খেলা জমে উঠত, সঙ্গে সঙ্গে রাতের অন্ধকারও জমে উঠত। এক এক বাড়ির প্রদীপ সব নিভে যেত, ঘরের পাশে সরু গলির পথটা ক্রমে নির্জন হয়ে আসত। চৌধুরিবাড়ির দোতলার জানলা থেকে যে এক ফালি সরু আলো এসে অন্ধকার গলির ওপর পড়ত, ক্রমে সেটুকুও অস্ত যেত। গলির ফাঁকটা ভরাট হয়ে উঠত জমাট অন্ধকারে। আর সেই কালো পাথরের মতো অন্ধকারের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে শুনতাম কে যেন পায়চারি করছে লাঠি হাতে খড়ম পায়ে—খট-খটাস! খট-খটাস। তার পরেই খুব দূর থেকে একটা খেঁকি কুকুর বুক ফেটে কাতরে উঠত—কেঁই-কেঁই! আর অমনি ঝুলের ঝালর ও মাকড়সার জাল দিয়ে ঘেরা আমাদের ঠাকুরদার আমলের পুরোনো ঠাকুরদালানের কালপ্যাঁচা ও চামচিকে-বাদুড়গুলো অন্ধকারের মধ্যে কখনও হুসহুস কখনও হিসহিস শব্দে তাদের বাচ্চাগুলোকে সাবধান করে দিত এবং মাঝে মাঝে ফটফট করে হাততালির আওয়াজে কাকে যেন আমাদের ঘরের দিকে তাড়িয়ে দিত! ওই বুঝি সে এল! এই ভাবতে ভাবতে আমার সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসত। হাতের তাস মাটিতে নামত না! বিনু ধমক দিয়ে বলত—"কী করছিস? খেল না!" তার এই ধমকানিতে আমার চটকা ভাঙত। আর সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের ওই বিশ্রী শব্দগুলোও যেন ভয়ে ভয়ে চুপ করে যেত। তা যদি না হত তাহলে বোধহয় ঘর থেকে ছুটে আমি বাবার কাছে পালিয়ে যেতাম, কিছুতেই বিনুর সঙ্গে খেলতাম না।

সেদিন খেলা আরম্ভ করতেই হঠাৎ খুব জোরে ঝড় বৃষ্টি এল। একটা ঝড়ের দমকা আমাদের কোলের তাসগুলোকে উলটে পালটে ভেস্তে দিয়ে ঘর থেকে খানিকটা ঝুল ও ধুলো উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। বিনু বলল—'মল্লি, দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করে দে!' আমি উঠে জানালাগুলো বন্ধ করতে লাগলুম। পশ্চিমের জানালাটায় হাত দিতেই কে যেন সজোরে আমার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সেকহ্যান্ড করে চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি হাতটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলাম—কিছু বুঝতে পারলাম না। বুকটা ধুকধুক করতে লাগল।

খেলতে বসেই সে বাজি জিতলাম। আশ্চর্য কাণ্ড! যা কখনও হয়নি, তাই হল। বিনুও অবাক। সে একটু বেশি করে মন দিয়ে খেলতে বসল। কিন্তু পরের বাজিও জিততে পারল না। আমার কেমন সন্দেহ হল—এলোমেলো ঝড় এসে তাসের যাদুটা উড়িয়ে নিয়ে গেল নাকি!

আমি ক্রমাগতই জিততে লাগলাম। কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছিল এ জেতায় আমার কোনো বাহাদুরি নেই। প্রতিবারেই এমন তাস আসছিল যে খেললেই পিঠ পাওয়া যায়। কে যেন ম্যাজিক করে ভালো ভালো তাসগুলো বেছে বেছে আমার হাতে তুলে দিচ্ছে। বিনু বার বার হেরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল—'আজ আমার পড়তা খারাপ পড়ল দেখছি!' তার এই দীর্ঘশ্বাসটি আমার বুকে গিয়ে বাজল! আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। আমার মন কেঁদে বলতে লাগল—'আমি জিত চাই না, বিনু জিতুক।' আমি ফন্দি করে বিনুকে জিতিয়ে দেবার জন্যে হাঁকুপাঁকু করতে লাগলাম; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আজকের ওই ঝড়ে কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেছে!

বিনু ফেলল হরতনের বিবি, তাকে সেই পিঠটা দেবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি খেললাম গোলাম, কিন্তু পিঠ তোলবার সময় দেখা গেল গোলামটা চেহারা বদলে সাহেব হয়ে গেছে। কাজেই পিঠটা আমাকেই নিতে হল। পরের হাতে আমি খেললাম চিড়ের দশ। আমি জানতাম বিনু এ দশ ফোঁটার লোভ কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। সে নিশ্চয় গোলাম দিয়ে পিঠ নেবে। বিনু ফেললও গোলাম, কিন্তু আমার দশখানা হঠাৎ দু ফোঁটা চুরি করে কেমন করে যে আটা হয়ে গেল আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। আমি অবাক; বিনু বাজি হেরে গোঁ হয়ে বসে রইল।

রাগ হলে বিনুর বড়ো বড়ো চোখ দুটো আরও বড়ো হয়ে উঠতে দেখেছি, কিন্তু আজ যেন অস্বাভাবিক রকম বড়ো হয়েছে বলে মনে হতে লাগল। সে বারের খেলাতে তার হাতের ফ্রাই ইসকাবনের দশখানার ওপর চিড়ের সাতা পাশিয়ে দিতে গিয়ে যখন সেটা রঙের সাতার তুরুপ হয়ে গেল, তখন তার সেই হঠাৎ বড়ো-হয়ে যাওয়া দুটো কেমন একরকমভাবে বিস্ফারিত করে সে আমার দিকে চাইল যে সে চাহনিতে আমার সর্বশরীর ঝিমঝিম করে এল।

বিনুকে ভয়ে ভয়ে বললাম—'ভাই, আর খেলে কাজ নেই, চলো যাই।' বিনু সে কথা কানেই তুলল না।

ক্রমে রাত গভীর হয়ে এল। মনে হল বাড়ির সবাই ঘুমিয়েছে। আমাদের এ ঘরখানারও যেন ঘুম ধরেছে—এর দরজা জানালা ইট কাঠে ঘুমে ঢুলছে।

প্রদীপের আলোটা থেকে থেকে কেবল হাই তুলছে। কড়িকাঠের খোপে খোপে চড়াই পাখিগুলো গল্প শেষ করে শুয়ে পড়েছে। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। হাতের তাসগুলোর দিকে চেয়ে দেখি সাহেব বিবিদের চেহারা ঘুমে জড়িয়ে আসছে। ক্রমে মনে হল সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ঘুমের ঝোঁকে দুলছে—ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম! আমিও তার সঙ্গে দুলতে লাগলাম—ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম!

হঠাৎ চটকা ভাঙল চৌধুরিবাড়ির ঘড়ির শব্দে—ঢং! সেই শব্দ অন্ধকারের ঘুম ভাঙাতে ভাঙাতে অনেক দূর চলে গেল।

ও কী? ও কীসের শব্দ? কড়িকাঠের কাছে ওই কোণের গর্ত থেকে কে এমন বিশ্রী সুরে নিশ্বাস টানছে হুউউসসস!—হুউউসস! আমি চমকে উঠে বিনুকে জিজ্ঞাসা করলাম—'ও কীসের শব্দ ভাই?'

বিনু কথা কইল না। শুধু তাস থেকে চোখ তুলে কড়ি কাঠের দিকে চাইল, আর আমার মনে হল তার সেই ড্যাবডেবে চাহনিটা চোখ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে কড়িকাঠের অন্ধকার কোণে এঁটে রইল—জ্বলজ্বল করে চেয়ে আমার দিকে। বিনুকে আমি কান্নার সুরে বললাম—'ভাই আমার বড় ঘুম পেয়েছে।'

বিনু বলল—'আচ্ছা, আর দু-হাত খেল।' আমি চমকে উঠলাম—তার গলা শুনে। কী গম্ভীর আওয়াজ! এ তো কোনো রকমে এই দুহাত খেলা এখন শেষ করতে পারলে বাঁচি! কোনো দিকে কান দেবার, কোনো দিকে চোখ দেবার আমার আর সাহস হচ্ছিল না। ইচ্ছা হচ্ছিল এই তাস দিয়ে চোখ কান ঢেকে ফেলি। আমি খুব চোখের কাছে তাস এনে একমনে খেলতে লাগলাম।

সে হাত বিনু খেলেছিল রঙের নওলা। আমার হাতে গোলাম ছিল, কিন্তু পিঠ নেবার ইচ্ছা ছিল না। কী করে লুকোলে বিনু সেটা ধরতে পারবে না ভাবছি, বিনু বলে উঠল সেই রকম বিষম ভারি গলায় ঘর কাঁপিয়ে—'গোলামটা আছে তো?'

ভয় হল ধরা পড়ে গেছি। বাঁ হাতের তাসের সারি থেকে চট করে হরতনের গোলামটা তুলে নিয়ে হরতনের নওলার ওপর ফেলতে গিয়ে দেখি—সামনে নওলা নেই; বিনুও নেই। অ্যাঁ! বুকটা ধক করে উঠল। এ পাশ ও পাশ চেয়ে দেখি শুধু বিনু নয়, একখানি তাসও নেই।

বোঁ করে মাথাটা ঘুরে গেল। চোখ অন্ধকার দেখলাম! গা হাত পা ঝিম-ঝিম করতে লাগল। ঘরের চার কোণ থেকে চারটে বিকট হাসি খিলখিল শব্দে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর ওপরের নহবতখানা থেকে ঢাক ঢোল কাঁশি বাঁশি সব একসঙ্গে